আজকের দিনটার জন্য

বিদ্যুৎ পাল

আজকের দিনটার জন্য

বিদ্যুৎ পাল

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

AJKER DINTAR JANYA

Collection of Poems by

BIDYUT PAL

© বিদ্যুৎ পাল

প্রথম প্রকাশ

মে, ১৯৮৪

প্রকাশক

অনুষ্টুপ প্রকাশনীর পক্ষে

সৃজন সেন

২ই, নবীন কুণ্ডু লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক

রেনেসাঁ প্রিণ্টার্স,

১/৫/১এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

গ্রন্থক

গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স.

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট / কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ

শঙ্কর দাস

দাম ঃ ছয় টাকা

উৎসর্গ

সেই বন্ধুদের, যাদের কাছে জীবন ও কবিতার
মাঝের সম্পর্কগুলো নিয়ে ভাবতে শিখেছি

সূচী

কলিমেরা ১ / ইতিহাসবিদ ১৫ / সশস্ত্রবাহিনী ২৭ / দেবীপ্রসাদের "সাতমূর্ত্তি" ৩৪ / মার্কসের "ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল" ৩৯ / আজকের দিনটার জন্য ৪২ / ঠিকানা পাটনা ৮০০০... ৪৪ / খোঁজ ৫৬ / আজ এই রাতে, দিদির স্মৃতিতে ৬৬

কলিমেরা

বাপ মায়েরা বিশ্বযুদ্ধ আর আকাল দেখেছিলো।
চটকলে ছাঁটাই হয়ে রজ্জাক
এই ছোট্টো শহরে এসে বিড়ির দোকান দিয়েছিলো।
"বেশ তো চলছে দোকানটা"
রজ্জাকের বৌ ছেলেকে বোঝায়
"বড়ো হচ্ছিস,
বুড়ো বাপকে সাহায্য কর!
তোর নামেই দোকান,
না হয় দুটো রুটি কম, তবু
রোজই জুটবে তো?
বাইরে গিয়ে কাজ পাওয়া সোজা কথা?"
ছেলের মন তবু মানেনা।
ওর রক্তের ভিতর কাজ করে
সময়ের ঘোড়ায় চড়বার মারাত্মক নেশা—
"দেখাই যাক না দুনিয়ার হালচাল
হাতে পায়ে জোর থাকতে মরবো কেন?".....
ওকে টানে এক পাঁচের টিকিটে দেখা আলোয় ঝলমল
বিশাল শহর
গতি আর কোলাহল.....

পরবের রাতে গলির মুখে টাঙানো পর্দায়

হাওয়া খেলে—
দোলে সুনসান মেরিন ড্রাইভ……
স্বপ্নের জগতের রহস্যময় ঠিকানা সব
ওরা তিন বন্ধু লুকিয়ে পালিয়ে যায় বম্বে মেল ধরে।

২

'কোথায় দাঁড়ালো ট্রেনটা ?'
জানালায় মাথা গলিয়ে বাইরে
অন্ধকারে তাকায় কলিম।
পাটনার এঁদো গলিতে কাদায়
চোদ্দ বছর ধরে বেড়ে ওঠা কলিম
মধ্যপ্রদেশের তারার নিচে
নিঃসীম অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে।
পাহাড়ের গন্ধ ভরা হাওয়া নাকে এসে লাগে।
'কি ভাবছে আম্মা ?
আব্বাজান ?'…
বাপের কাঁধে চড়ে চার বছরের কলিম একবার
সোনপুরের মেলায় গিয়ে মাটির বাঁশি কিনেছিলো।…
কলিমের ভয় ভয় করে।
দুই সাথীর মুখের দিকে তাকায়।
ষোলো বছরের রফিক পোড় খাওয়া বেশী।
একবার কলকাতায় পালিয়ে গিয়েছিলো।
রফিক সামাল দেয়—
'ঘাবড়াসনা।
নে বিড়ি ধরা।'
কলিম বিড়ি ধরিয়ে কাশে।

ওর ঘুম পায় ভীষণ।

ট্রেণে এক রত্তি জায়গা নেই।

ওপাশে কিসের ঝগড়া শুরু হলো হঠাৎ ?

বেঞ্চে বসে দুটো লোক হাসতে হাসতে কথা বলছে।

...সব ঠিকেদারের ব্যাপার !

গ্রাম ঝেঁটিয়ে লোক নিয়ে চলেছে।

ফসল খারাপ। কাজ নেই। তা কাজ দেবে বলে

নিয়ে চলেছে ঠিকেদারের দালাল।

নেবার সময় বলেছিলো রাস্তায় খেতে দেওয়া হবে।

এখন বলছে যে যার মতো কিনে খেয়ে নাও

পরে হিসেব হয়ে যাবে।

হিসেব হবে কচু।.....

কলিমের শুনতে শুনতে খিদে পায়।

ওদিকে ঝগড়াটা বচসা থেকে হাতাহাতিতে উঠেছে।

ট্রেন চলতে শুরু করে।...

ভোর রাতে ঘুম ভাঙে।

চেকিং।

রক্ষিক সাবধান করে দেয়—'খবরদার।

বাড়ির ঠিকানা বলবি না।'

৩

জেল থেকে বেরিয়ে আসে।

স্বপ্ন নয়

অন্য কিছু ঠিকানা পকেটে নিয়ে।

বম্বই—মাহিম বস্তী, ভিক্টোরিয়া গোদী,
ছোটো বড় সমস্ত রেস্তোরাঁ,
ঠিকানা দেখে ঘুরে ঘুরে
অবশেষে কাজ পায় কলিম।
থাকার ঘর নেই, ফুটপাথ
খাবার গলায় আটকে যায়—
খারাপ বলে ততোটা নয় যতোটা
'ঘর' ও 'আজাদীর' দোটানায়।
তবু পিছনে কে ফেরে ?
একজন বলেছে একটা ভালো কাজ পাইয়ে দেবে।

ইস্!
সদ্য পরিচিত ওই গোদীর ছেলেটা
লাট সাহেবের মত ঘোরে।
মটোর মেকানিকের কাজ শিখে নিয়েছে।
দাঁতে বিড়ি চেপে কথা বলে।...
বলুক।
কোই বাত নহী!
আমিও বলবো।
ব্যাস কোনো একটা ভালো কাজ শিখে নিই।
তারপর।...
তাছাড়া সারাদিন সারারাত
চোখের সামনে মুখর বিশাল শহর।
সেদিন আন্ধেরীতে গিয়েছিলো।
সেই রাজকাপুর। মোটা বামপু হয়ে গেছে!

ডকে লেগে থাকে বিরাট সব জাহাজ।

ঝিলমিল করে আরব সাগর।

মরিশাস ওদিকেই না?

লাক্ষাদ্বীপ? জাঞ্জিবার? আরব?

ওদিকে শুনেছি লেবারের খুব ডিমাণ্ড আছে?

সতেরো বছরের কলিম

পোড় খাওয়া হাতে সূর্য্যকে আড়াল করে

পিপাসার্ত্ত চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে,

মায়ের হাতের বেড় থেকে অনেক

দূরে দাঁড়িয়ে।

৪

রজ্জাকের বিড়ির দোকানে

ফ্লোরা ফাউণ্টেনের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার

বিবর্ণ হয় ধীরে ধীরে।

দু'বছর···পাঁচ বছর···দশ বছর···।

কতো জায়গা থেকে দুর্ঘটনার খবর আসে।

মা-বাপ ভয় পাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এখন।

মন্ত্রগোণা খবর পেয়ে দু'বার কলকাতা, দু'বার বোম্বাইও

গিয়েছিলো রজ্জাক।

কোনো হদিশ পায়নি।

কেজানে কোথায় আছে কলিম।

কলিমের ছোটো ভাই এখন কিশোর।

লুঙ্গি পরে একাই দোকান সামলায়।

বাপের থেকে বেশী ওস্তাদ,
পরিবারের ভার কাঁধে নিয়ে ভারিক্কী চালে হাঁটে।

৫

কোথাও খনি ধ্বসে যায়
কোথাও মাচান ভেঙে যায়
ভারাশুদ্ধ হুড়মুড় করে নেমে আসে বহুতল বাড়ী,
কোথাও শহর ভেসে যায় সমুদ্রের ঝড়ে,
মাঝে মাঝেই গুলি চলে বিভিন্ন এলাকায়
অথবা বিষাক্ত মদ খেয়ে লাশ হয় পুরো একটা বস্তী,
কোথাও আগুন নেবেনা সবকিছু না পুড়িয়ে দিয়ে—
কলিমেরা মারা যায়
কলিমেরা বেঁচে ওঠে।
কেউ মিথ্যে স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলো
কেউ সামান্য রুটির আশ্বাস নিয়ে গিয়েছিলো
ভেদ মুছে যায়—
জেগে ওঠে
প্রতিদিন বেঁচে থাকবার তাগিদ আর লড়াই,
প্রতিদিন বেঁচে থাকবার ঝাঁঝালো অনুভব।
আর জেগে ওঠে
উনিশশো আশীর এই ভারতবর্ষে
প্রতিদিন বেঁচে থাকবার জন্য জরুরী মিছিল আর
লালঝাণ্ডার সাথে পরিচয়।

কেউ সহজ বিশ্বাসে নিজের করে নেয়,
কেউ সন্দেহে পাশ কাটিয়ে থাকে কিছুদিন,
তবু বন্‌ধের একটা ডাকে নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া
এলাকাটা দেখার গর্ব ও আনন্দ
মুখ দিয়ে বলিয়ে ছাড়ে—"বুঝলি !
এই হলো মজদুরের তাকৎ !"
পাঁচ সাত বছর পর একটা করে সঙ্কট,
পাঁচ সাত বছর পর একটা করে তুমুল হয়ে ওঠা
জন আন্দোলন...
কে গিয়েছিলো দিলীপকুমার হতে ?
কে গাইতো মুকেশের গাওয়া, শৈলেন্দ্রের
দুঃখের গানগুলো !
তার মুখ দিয়েও বলিয়ে ছাড়ে জীবন
শৈলেন্দ্রের অতীত গান ও আজকের স্লোগান
"হর জোর জুল্মকে টক্কর মে,
সংঘর্ষ হমারা নারা হ্যয় ।"

৬

পাটনা স্টেশনে
ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে লোকটি ।
আঠাশ বছরের যুবক ।
খাকি প্যাণ্ট আর চেকের শার্ট গায়ে ।
পকেটে সিগারেট, দেশলাই আর ঘামে ভেজা রুমাল ।
দাড়ির গোড়াগুলো শক্ত ।
কণ্ঠস্বর ভারী, পশমী ।

ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়।
ভোরের আলোয় তার শৈশবের শহর,
ছোট্টো শহরটা হাসছে।
ক'বছর হলো ?
দশ ? বারো ? চোদ্দ ?
শেষ ছ'বছর বাড়ীতে চিঠি দেওয়া শুরু করেছিলো।
তার উত্তরও পেয়েছিলো।
মা বাপের আকুল ডাক।
ছোটো ভাইয়ের গম্ভীর, দাদার মতো উপদেশ।
কিন্তু প্রথম দু, তিন বছর তো পয়সাই ছিলোনা ফিরবার।
আর শেষ তিন বছর সে ইচ্ছে করে ফেরেনি।
কেননা সলমাকে স্বীকার করে নেয়নি বাড়ীর লোকেরা।
সলমার মুখটা মনে আসে হঠাৎ।
সীটের একপাশে রাখা
সলমার রুমালে বাঁধা আপেলটা দেখে।
রাত্রে খায়নি সে।
এই শহরে নেমে ওটার স্বাদ পেতে চেয়েছিলো।
তার বৌ সলমা।
বুড়ো ক্রেন ড্রাইভার আফজলের মেয়ে।
পঁয়তাল্লিশে করাচি থেকে এসে
বোম্বাইয়ে আস্তানা গেড়েছিলো আফজল।
না,
সলমাকে নিয়ে এসে এবারে
ঝামেলা পাকাতে চায়নি কলিম।
আগে ব্যাপারটা রপ্ত হোক,
তারপর।

উঠে দাঁড়িয়ে
সফরের সাথী
সামনের দাড়িওয়ালা লোকটিকে হেসে বললো—
"চলি মশাই
এক দেশে পৌঁছে গেলাম
অন্য দেশ মনে পড়ছে।
বলছিলাম না কাল রাতে,
যেখানেই ভালোবাসা, সেখানেই দেশ?"...

ভিক্টোরিয়া গোদীর মটোর মেকানিক কলিম
পাটনা স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ায়।
সকলকেই মনে হয় পরিচিত।
কথা বলতে ইচ্ছে হয় বাস কণ্ডাক্টরের সাথে।
"চিনতে পারেন?
বাসের যাত্রীরা সকলে? চিনতে পারেন?
আমি সেই ছোট্টো কলিম।
পাওয়ার হাউজের চিমনি!
পার্ল সিনেমা!
এক পাঁচের ভোল পাল্টে যাওয়া টিকিট ঘর!
চিনতে পারলেন?
দশ লক্ষ মানুষ! চিনতে পারলেন আমাকে?"

চোদ্দ বছর পর কলিম
তার গুলি ডাণ্ডা খেলা ছোট্টো গলিটার ভিতরে ঢোকে।
আর হঠাৎ
বাড়ীর দরজাটার দিকে তাকিয়ে
চোদ্দটা বছর তার চোখ বেয়ে নেমে আসে।

চোদ্দ বছর সে ভাবেনি
বাড়ি ফেরা যে এত অসহ্য বেদনাদায়ক
ভালো লাগা হতে পারে।...
দরজা খোলা ছিলো।
তবু পরিচিত বারান্দাটায় সে ঢোকে না।
বাইরে ভেসে আসে পাঁচটা পরিবারের কোলাহল।
সে কড়া নেড়ে যায়।
কড়া নাড়তে তার ভালো লাগে।

৭

ওরা দশটা জীবন পার করে ওদের একটা জীবনে।
এতো বড়ো দেশ ভারতবর্ষ
এদেশের শিরা উপশিরায়
ওরা ঝোড়ো রক্তের মতো ঘুরে বেড়ায় ...
যেসের রাঁধুনি ছেলেটা অস্থায়ী দারোয়ান হয় ব্যাঙ্কের
তারপর চায়ের ষ্টল দেয় বাজারে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়ে
তারপর রিকশাওয়ালা
অথবা বাদামের ফেরীওয়ালা
কিম্বা ডিম বেচে সন্ধ্যায়
তারপর একদিন জি. টি. রোড পার করে বালির ট্রাকে
ঝরিয়ায় রাতের শিফটে ভূগর্ভে ঢোকে—
ডেটোনেটরের কর্ডের রোলটা কিছুদিন
মিথ্যা ভয়ে টপকে পেরোয়।
সেখানেও বেশীদিন নয়।

কিছুদিন ধানবাদ পাথরডিহি ট্রেকারের ক্লীনার
তারপর পাকাপোক্ত ড্রাইভার
তারপর কে যেন খবর পাঠায় তার ঘর
সিতামড়ি থেকে
ফিরে গিয়ে কাঁটি থার্মালে পাকা একটা কাজ পায়।

কল্যাণের সেই ছিপছিপে ফর্সা ছেলেটি!
রেসিন প্ল্যাণ্টে বাবা মারা যাওয়ার পর
বন্ধুদের চক্করে পড়ে
মেরিন ড্রাইভে গিয়ে তিনপাত্তি শুরু করেছিলো
সেখানে মারপিট করে বম্বে সেণ্ট্রাল জেল...
বেরিয়ে এসে
খাণ্ডালা থেকে বেলগাঁও ফেরিওয়ালা
তারপর পুণায়—কোন না কোন কোম্পানীর এজেণ্ট
হাতে ব্রীফকেস—
কোহ্লাপুর এক্সপ্রেসের বগিতে
মেঝেতে কাগজ পেতে বসে ওরা
চারবন্ধু ব্রীফকেস বাজিয়ে কাওয়ালি গাইতে শুরু করে।

বাহাত্তরে চেকের লুঙ্গি পরে, ঠোঁটে বিড়ি গুঁজে
কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে গলে বাংলাদেশ গিয়েছিলো
সুনীত।
কার না কার ঠাকুর্দার সম্পত্তি ক্লেম করে
কিম্বা অন্য কোনো রকম ভাবে
যুদ্ধ শেষের বাজারে মাল কামাবার ধান্দা করেছিলো।
হালে পানি পায়নি।

কোথায় কোথায় ঘুরলো তারপর।
মাঝে পরিবারের ব্যাবসা, মিষ্টিও বিক্রী করলো কিছুদিন।
সেদিন হঠাৎ দেখা হলো,
রক্সৌল এলাকার নাম করা রেফ্রিজারেটার মেকানিক,
সাথে স্মাগলিংটাও উপরি হিসাবে রয়েছে।

শুধু এরাই নয়। কোড়াইকানালের মেয়ে এগনেস
হাসপাতালের ভ্যানে ঘুরে বেড়ায় দক্ষিণ বিহারের গ্রামে।
জানালা দিয়ে দেখে
বাচ্চাটা মোষের পিঠে চড়ে
ওদের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে—
কেন ওই বাচ্চাটা মরে যায় বারবার?
কলেরায়? বসন্তে? দুর্যোগে?...
হাসপাতালে ভূস্বামীদের লম্পট ছেলেগুলো
জুল জুল করে তাকায়, ইশারা করে—
ও দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে,
"শালা নার্স মানেই যেন..."
সামনের বছর ও কানাডা যাওয়ার চেষ্টায় আছে।
"মিডল ইস্টও হতে পারে, যুদ্ধতো লেগে আছে হামেশাই।"
মোজাটা পরতে পরতে এগনেস
শশীর ছবিটার দিকে চোখ ফেলে একবার,
জুতোর ধুলো ঝাড়ে মেঝেতে পটকে।

লামডিংয়ে কুলিরা ঘিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলো—
"সারা দুনিয়ায় কুলি মানে বিহার উত্তরপ্রদেশ,
বাবু মানে বাংলা।..."

বিনা টিকিটে বিদিশা অব্দি পৌঁছোতে পেরেছিলো
জব্বলপুরের ওই বাচ্চা ছেলেটা।
রেলিং টপকে পার হয়ে তারপর
ঝুড়ি মাথায় উদয়গিরির কাছে
হাজার বছরের ভুস্তর সরিয়ে রাজত্বের
কঙ্কাল বার করতে লেগে গিয়েছিলো।

আর কেরলের রাস্তার সেই অনাথ ছেলেটা?
সমুদ্র প্রেমিক?
জুতো পালিশে দিন না চলাতে ট্রেনে চেপে বসলো।
সফরী রোজগারে পেট চালাতে চালাতে
পাড়ি দিলো তিন হাজার মাইল।
পারাদীপ।
সেখান থেকে ফিরে কলকাতা।
তখন সারা দেশে সংকট।
বেকারের সংখ্যার কোনো হিসেব নেই।
শ্রমিকেরা পর্যুদস্ত।
খুন, রাহাজানিতে রাতগুলো চটচটে কালো।
তবু হাতে পাওয়া সিঁদুর কারখানার কাজটা
সে ছেড়ে দিলো।
কেন না একদিন
বর্ষা বাদলা আর ঝড়ের সন্ধ্যায় সে শুনলো,
বঙ্গোপসাগরে তুফান উঠেছে।
আর তার মন কেমন করে উঠলো তার ছোটোবেলার সাথী
আরবসাগরের কথা ভেবে।
এলাহাবাদে জেল খাটলো তিনমাস।

মানমাড়ে আবার।
সাত মাস পরে বোম্বাই।
কোথাও কাজ নেই।
না খেয়ে মাথা ঝিমঝিম করছে।
ব্রীজের ওপর শুয়ে পড়েছিলো প্রায় অচেতন ভাবে।
একজনের উপদেশ শুনে গোয়া পাড়ি দিলো।
তার সাথে গোয়াতে যখন আমার দেখা হয়েছিলো
রাতের নির্জন সমুদ্র তীরে
একমাত্র মদের দোকান আর রেস্তরাঁটায়—
আমার দিকে চায়ের গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে
পরিষ্কার বাংলায় বলেছিলো—
(পাঁচ ভাষায় সম্ভাষণ করতে জানা
বছর পঁয়ত্রিশের সেই লোকটা)
"হ্যাঁ, মাইনে এখানে কম ;
কিন্তু সমুদ্র আছে যে!"

ইতিহাসবিদ

এক গ্রীষ্মের দুপুরে তাঁকে দেখলাম।
ধুলো আর আবর্জনা ভরা রাস্তাটার একধার দিয়ে তিনি
বাড়ী ফিরছিলেন ; বগলে কিছু জার্ণাল
আর হাতে একটা সদ্যোজাত জামচারা
যার পল্লবিত শীর্ষ তাঁর মাথার
খানিক ওপরে উঠে দুলছিলো।
আমি দেখলাম তার হাতের সেই শিশুটিকে—
অতীতের কোনো মাটিতে তিনি যার শিকড়
প্রসারিত করতে পারবেন না কখনো।
যাকে দিতে হবে আজকেরই পৃথিবী।
ফলের কালোগুচ্ছ যেদিন অন্য এক জৈষ্ঠের হাওয়ায় দুলবে
সেদিন হতে পারে তিনি থাকবেন
হতে পারে
তিনি থাকবেন না।

১

ধ্বংসের নুন আর ক্ষয়ের রসায়ণের সাথে তাঁর করতল
কথা বলে।
নিজের ভিতরে
তিনি পাখীদের তৈরি করেছেন
যারা মাঝে মাঝে সময়ের বিলুপ্ত ঢেউয়ের দিকে উড়ে যায়।

ডুব দেয়

অনুভব করে জলের স্তর

মাত্রা

ক্ষীণ অন্তঃস্রোত

দিক

ঝড়ের সম্ভাবনা

সমাজের কোনো একটি মুহূর্ত্তের রক্তচাপ।

একটি মুহূর্ত্ত।

স্থির! পৃথিবী, আকাশ, সূর্য্য ও মেঘের ছায়া

স্থির! চারদিকে জনপদের পর জনপদ!

স্থির! অসংখ্য মানুষ

যে যার নিজের কাজের তৎকালিক ভঙ্গিমায়

স্থির! শাসকের উদ্যত হাত

স্থির! বাঁচতে চাওয়া বন্দীর চিৎকার করে ওঠা মুখ

স্থির! পাহাড়ের কোলে একলা মা

তার সন্তানকে ডাকতে গিয়ে

স্থির! বাদ্যযন্ত্রের ওপরে একটি হাত

স্থির! তিনটি স্বরের ওপরে আঙুল

স্থির!

সমস্ত কিছু স্থির!

প্রবাহের এক প্রস্থচ্ছেদ ফলকে

যন্ত্রণা, স্বপ্ন, কণ্ঠস্বর—

জীবনের সেই একটি মুহূর্ত্তের স্থির বিশিষ্ট নিশ্চিতি!...

পাখীরা সেই লুপ্ত মুহূর্ত্তের

স্থির, স্তব্ধতার ভিতরে কলরব করে ছড়িয়ে পড়ে।

অসংখ্য অসম্বদ্ধ ঘটনার মাঝে
পারম্পর্য্য আর কারণের গোপন সূত্রের
খড় আর গভীর শিকড়গুলো খুঁজে খুঁজে তুলে
উঠে আসে
ঢেউয়ের ওপরে আবার !
ডানার কার্বন আর কালের জল ঝেড়ে
কয়েক যুগ নিমেষে পার হয়ে এসে ঢুকে পড়ে
তাঁর বুকের ভিতরে।
পাখীরা অদৃশ্য
তবু তারা যে ফিরে এসেছে তা
গ্রন্থাগারের এক কোণে হঠাৎ
উজ্জল হয়ে ওঠা তাঁর দুই চোখের দিকে তাকিয়ে
জানা যায়।...
তখন কাগজের ওপর বাক্যেরা বেরিয়ে আসে
ধোঁয়ার ভিতর থেকে যুক্তির ধারালো গ্রানাইটের মতো।
একদা বিলুপ্ত ধূলো আর কোলাহলে
ভরে যায়, গোধূলির খেলাশেষের গ্যালারীর মতো
তাঁর টেবিল
কলম আর চশমার রঙচটা খাপ।...
একদিন ছাপাখানার যন্ত্র ঘর্ঘর করে ওঠে।
আর এক আর্দ্র সকালে, শহরের
বইয়ের দোকানগুলোর কাঁচের ভিতরে এসে
রাস্তার দিকে তাকায়
পথ চলতি ব্যস্ত আমাদের
হারানো বয়স
অপরিচিত পরিচয়।...

আর ওই পাখীরা।
ওদের প্রাণবীজ এই উপমহাদ্বীপের তীরে
বণিকের জাহাজের সাথে মুদ্রার নিয়মের মতো এসেছিলো।
সার্বজনীন সমতুল্য বস্তুর দুনিয়ায়—
ব্রিটিশ রাষ্ট্র নিজেকে কায়েম করেছিলো—
'সে সোনা, মুদ্রা হওয়া তার অধিকার!'
তবে গম কোথায় দাঁড়িয়ে? কাপড়? খনিজ?
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিক্রমা পথে আসা সবকটি জনতা,
সাপেক্ষ মূল্য খুঁজতে শুরু করেছিলো নিজেদের।
নতুন তৈরি শহরের গলিতে ময়দানে
নতুন তৈরি কলেজের সিঁড়িতে, গ্রন্থাগারে—
সাম্রাজ্যের প্রহরীর চোখের সামনে দিয়ে
গ্যালিলিও'র দূরবীন হয়ে
ক্রমওয়েল, রবেসপীয়েরে কিম্বা গ্যারিবল্ডীর নাম হয়ে,
শেলীর কবিতা হয়ে,
ঢুকে পড়েছিলো সেই খোঁজ, সাপেক্ষ মূল্যের.
রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হবার জন্য জরুরী ঐতিহাসিক শ্রমের
নিজের মূল্যকে নিজেতে পাওয়ার,
আর ওই পাখীদের প্রাণবীজ স্পন্দনে ভরে উঠেছিলো।

শহরের বিপন্ন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে
তামাটে রোদ পোড়া চেহারার যুবক
ভাবতে শুরু করেছিলো—
"কেন এত অপমান? প্রতিদিন?

কে আমরা ? কোত্থেকে এসেছি ?
ওদের প্রশ্ন করলে বলবে "গ্রীস, রোম,
মধ্যযুগ, নবজাগরণ ?
অনেক রক্তপাত, অন্ধকার, তবু বার বার আন্দোলিত মানুষ।"
কি বলবো, যদি আমায় প্রশ্ন করা হয় ?
স্মৃতিতে একটা পুরো দস্তুর মানুষ নেই ?
সবই দেবতার কার্য্যকলাপ ?
কে আমরা ?
কেন আমরা পরাধীন হলাম ?
কখনো কি স্বাধীন ছিলাম ?
কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত
কামানের গর্জনে ভেঙে দেওয়া গেল না ?
সবই দেবতার হাত ?
অথবা এ সামাজিক জড়তার এক ভয়াবহ অন্ধকার
যা আমাদের নিজেদেরই জীবনের প্রতি
বিশ্বাসঘাতক করে ফেলেছিলো ?
আর জরুরী হয়ে পড়েছিলো
আত্মহননের পাঁকে ডুবে থাকা এই ভূখণ্ডে এক চেঙ্গিস খান ?
তরোয়াল আর ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ দিয়ে নয়
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কাপড়ের কল আর রেললাইন দিয়ে
ভারতকে ভারত হিসেবে বেঁধে ফেলা জরুরী হয়ে পড়েছিলো ?
মুক্তিতে জড় ছিলো তাই বন্দীত্বে গতিশীল হয়ে ওঠা
ঐশ্বর্য্যে অসুস্থ ছিলো তাই দুর্ভিক্ষে স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠা
নির্দ্ধারিত হয়ে পড়েছিলো ?'.....

এই সব প্রশ্নের সাথে প্রাণ পেয়েছিলো সেই পাখীরা।

ডানার চাড় দিয়েছিলো। আর তাছাড়া
সাম্রাজ্যের জাহাজ নাবিক ছাড়া চলতে পারে না।
আর যেমন নাবিকের স্মৃতি
অনিবার্য্যভাবে ছিলো সাম্রাজ্য বিরোধী—
স্মৃতি যাতে সেদিন চেরীর টুকরো বসানো
সোনালী কেক ছিলো যা সে ক্রীসমাসের রাতে কিনতে
পারেনি ;
ক্রীসমাসের রাতে তার সন্তানের ব্যাথিত নীল চোখ
আর জুতোর ভিতরে বরফ গলা ময়লা জল ছিলো
ছিলো শহরের ঘিঞ্জী এলাকায়
ধূসর ধ্বসে যাওয়া গালগুলো
ব্রিজের উপর ভিখারি,
ছিলো দেওয়ালের বাইরে ঝরে যাওয়া সন্ধ্যাকে
দু'চোখে পাওয়ার জন্য লড়াই…
তেমনই এখানেও,
সদ্য তৈরি কারখানার আশে পাশে
যদি জেগে উঠছিলো নতুন ম্যাঞ্চেস্টার নতুন লিভারপুল,
যদি জেগে উঠছিলো নতুন 'আইরিশ কোয়ার্টার'
লিয়নস্ আর সাইলেসিয়াও কি খুব দূরে ছিলো ?
খুব কি দূরে ছিলো আঠেরোশো আটচল্লিশ ?…
এখানেও সেদিন
চলে এসেছিলো জেনেভার ডাক—
সন্ধ্যাকে পাওয়ার জন্য হড়তাল।…
তাই অনিবার্য্য হয়ে পড়েছিলো
খোঁজা,
সেই বিশাল পারম্পর্য্য, সূত্রবোধ
হাড়ের বয়স

আয়ের ঘুমপাড়ানী গানে ব্যথা আর বিদ্রোহের তড়িৎপ্রবাহ
যাতে দেশ, দেশ হয়ে ওঠে।...

অতীত শুধু আবিস্কৃত হয় না, জন্ম নেয়
জন্ম নিলো ভারতের আত্মচেতনায়।
মহান ইতিহাসবিদেরা এলেন।
তাঁরা দেবতার মুখোশ সরিয়ে ফুটিয়ে তুললেন
মানুষের মুখ।
রাখালের, শিকারীর, যাযাবরের, কৃষকের মুখ।
তাঁরা দেববাণীর শব্দের মরচে মেপে ফুটিয়ে তুললেন
মানুষের ভাষা।
রাখালের, শিকারীর, যাযাবরের, কৃষকের ভাষা।

এবং আমাদের এই বৃদ্ধ ইতিহাসবিদও
তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে এসে এগিয়ে গেলেন।

৩

তাঁর শরীর একটি একটি করে তাঁর
বছরগুলোকে অতীত করেছে।
তিনি একশো একশো করে ফিরিয়ে এনেছেন অতীতের বছর।
পাটনার রাস্তায় শ্রাবণ তাঁকে বৃষ্টিতে ভিজিয়েছে।
কাদা ছপছপে রাস্তায় দাঁড়িয়ে
সুদূর প্রশ্নের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন—

"ও কিছু নয়! সূর্যের কক্ষপথের ধুলো,
ঋতুদের অল্মাইড আর হাজার বছরের
বর্বর ভাববাদের কুহক!
ওই বৃষ্টির ওপারে
যদিও দেখা যায় না তবু রয়েছে
আমাদের রক্তে লীন দৃশ্যাবলী।
কি বলছো?
সম্রাটদের কেচ্ছাকাহিনী?
না।
আগে আমি শুল্ক আদায়ের ফর্মানটা চাই।
রাজ দরবারে একজন সাধারণ মানুষের প্রবেশ!
না রাজার দানের কাহিনী নয়
ও কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কি করে, জানতে চাই।
দেবতার বর যে পেয়েছিলো—কেন চেয়েছিলো?
কিভাবে উৎপন্ন হলো প্রবাদ আর কিম্বদন্তীগুলো?
আর শ্লোকের, মন্ত্রের ভিতরে ওই
টুকরো টুকরো জীবনের ছবি?
আমি সাধারণ শব্দগুলো চাই।
ধান, মুদ্রা,
জমির সত্ত্ব, তার হাত বদলের নিয়ম
দেনা, খাজনার প্রতিশত,
ডাকাত, পাইক,
বলদ, লাঙল,
তাঁত, সদাগর, লোহা, নুন, নৌকো, মাছ!...
যাজ্ঞবল্ক ও মনুসংহিতায় এ কিসের লড়াই?
দুই উৎপাদনব্যবস্থার?

প্রাচীন রাজনীতি সাহিত্যে
রাষ্ট্রের কার্য্যপ্রণালী নিয়ে এত প্রখর চিন্তা রয়েছে
রাষ্ট্রের সারবস্তু ও রূপ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই কেন ?"...
.....
এই সব বলতে বলতে তাঁর জীর্ণ বার্দ্ধক্যগ্রস্ত শরীর
হাঁটু অব্দি-প্রায় পাজামা আর ছেলের
পুরোনো পাঞ্জাবীটা পরে
আর বুড়ো কর্মোর‍্যাণ্টের ডানার রঙের শতছিদ্র ছাতাটা
মাথার ওপর মেলে দিয়ে
এগিয়ে গেছে,
একই সাথে আজকের ট্রাফিকের ভীড় ও সময়ের
ট্রাফিকের ভিতরে।
মানুষ যেই পথে এগিয়েছে ক্রমান্বয়ে
যে কোনো মানুষের স্মৃতিচারণের মতো তিনিও
অনুসরণ করেননা সেই পথ
পিছোবার বেলায়।
দশই জুলাই উনিশশো আঠাত্তর থেকে সোজা
গুপ্ত সম্রাটদের ঘরে ঢুকে নথীপত্র হাতড়ান।
কিম্বা কোনো এক বৌদ্ধশ্রমণের সাথে বসে পড়েন
নালন্দার চাতালে।
বিহার বাংলার পথে ঘোড়া ছুটিয়ে
শহন্‌শাহের আদেশ নবাবের কাছে নিয়ে আসা লোকটির
পাশে পাশে
অদৃশ্য ঘোড়ায় চড়ে যেতে
তাঁর কোমরে ব্যথা হয়না একটুও।
তন্মুহূর্ত্তে আবার ফিরে আসতে পারেন,

অথবা ফিরেও আসতে হয়না—
অতীতের দৃশ্যদৃশ্যান্তরের ফাঁক দিয়ে তাঁর
চোখের সামনে ভেসে ওঠে
আজকের তরুণ এক শিক্ষকের মুখ, তাঁর বিভাগের ;
তিনি তার নমস্কারের প্রত্যুত্তর দেন—
অদৃশ্য ঘোড়ায় সওয়ার—
কোন জনপদ, কোন শতাব্দী থেকে ?

৪

আজ !
আমি এই কবিতা লিখছি ! আজ !
দিনের পর দিন কতো ছড়িয়ে পড়ছে এই আজ !
যতো গভীর, যতো প্রসারিত হচ্ছে চেতনা
ততো ব্যপ্ত হয়ে পড়ছে।
মানুষের সমস্ত জন্ম, মৃত্যু ও নবজন্ম
আজই তো হলো।
আজই তো সকালে
আজটেক, সুমের অথবা হরপ্পার রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে
আমি নৌকোর জল ছাঁচছিলাম।
আজই তো সকালে নালন্দার গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে
শীতের হাওয়ায়
উত্তরীয়টা ভালো করে জড়িয়ে নিয়েছিলাম।
এইতো একটু আগে আমি
মেকসিকো শহরের একটা বাড়ীর পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে
কাপড় কাচা সাবানের গন্ধ আর

বাচ্চাদের কলরব পিছনে ফেলে
এখানে পাটনায় এই ঘাসের ওপর বসে লিখছি।
অদূরে রাখা আমার সাইকেলের
ছায়া পড়ছে জোহানেসবার্গের রেললাইনের ধারের
শ্যানটির দেয়ালে।
কেউ ডাকলো আমার নাম ধরে—কোত্থেকে ডাকলো ?……
ইতিহাসবিদ !
এ আমার আপনার প্রতি ঋণ !
তাই এই আটাত্তরের জুলাইয়ের দুপুরে
আমি গাইছি আপনাকে।
আপনাকে ও আরো সকলকে আমি গাইতে চাই
যাঁরা রক্তের গঠনে হাজার বছরের
বীজ ও বেদনা চিনিয়ে দিয়ে যান।…

৫

তবু আজ !
কতো সঙ্কটজনক এই আজ !
এইতো দুপুর বেলায়
ইতিহাসবিদের সমবয়সী ওই বৃদ্ধ
বই বাঁধাইয়ের দোকানটা থেকে বেরিয়ে
রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েছেন ……
তিনি পড়তে জানেননা,
কিন্তু দুবেলা খাবার আর পরনের কাপড় আর
এক চিলতে ঘরভাড়া মজুরির বদলে

বইয়ের আর খিসিসের
সুন্দর টেঁকসই মলাট তৈরি করে গেছেন জীবনভর…
আর তাঁর পাশে একটি শিশু
সেও পড়া শুরু করতে পারেনি
কিন্তু বইয়ের সুন্দর বাঁধাই করা শুরু করে দিয়েছে…
আর ওই যে লোকটি
ইতিহাসবিদকে নমস্কার করে চলে গেল ;
প্রেসে কাজ করে
ইতিহাসবিদের কাজের পাতার পর পাতা
সে যত্নের সাথে ছেপেছে
কিন্তু কখনো পড়তে পারেনি…

ইতিহাসবিদ !
আপনি কি ভাবছেন
কি অর্থ
ইতিহাসের পথে বিকশিত একটি শব্দের
যদি আজকে ওই শব্দের রক্তকে যে শরীরে ধারণ করে
সে না জানে
ওই শব্দটার ইতিহাস ?

সশস্ত্র বাহিনী

ওরা পরে জলপাই রঙের কাপড়।
ওরা পরে মাটির রঙের কাপড়।

কত সুন্দর স্বাস্থ্য ওদের!
মজবুত হাড় দিয়ে গড়া পেশীবহুল শরীর
যেন পৃথিবীর আরো অনেক সকাল দেখে যাওয়ার শপথ!

আর চলা!
শিরস্ত্রাণ, বেল্ট, জুতো আর অস্ত্রে সজ্জিত
ওরা কুচকাওয়াজ করে যায়—
এক কদম—এক আওয়াজ
হাজারটা কদম—এক আওয়াজ...
কত দুরূহ যাত্রার অনুভবে আবিস্কৃত এই সংগীত!
আমাদের চেতনায় আজ যা কিছু সুন্দর, আকাঙ্খিত
তার নির্মাণের পথে এগোবার নির্ভুল পথের মতোই
নির্ভুল ওই সংগীত!
দেশের সবগুলো এলাকায় ছড়ানো ওদের ছাউনিগুলোর ওপর
রাতের হাওয়ায়
রুটি, ডাল আর গরম সব্জির গন্ধ ভাসে
তামাক আর চায়ের গন্ধ ভাসে
ওদের হাসি, ওদের গান, ওদের পুরুষালি কণ্ঠস্বর ভাসে।

আর দেশের জনতা,
যারা এসবকিছুই প্রতিদিন পেতে চায়—
যখন দাবী তোলে,
ওরা সন্ত্রাস ছড়াতে এগিয়ে আসে
ওরা হত্যা করে ॥

যেই ধুলো যেই রক্তে ওরা গড়ে ওঠে
একদিন তার বিরুদ্ধে ওরা গুলি চালায়।
যে দুটো চোখের প্রতীক্ষা মনে রেখে
ওরা বরফের ঘা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দুর্গম
সীমান্ত অঞ্চলে
একদিন শাসকের আদেশে ফিরে এসে
সেই দুটো চোখ ওরা বরফ করে দেয়।

কৃষক ও শ্রমিকের ওরা সন্তান।
কৃষক যে জমিতে কাজ করে
শ্রমিক যে শিল্পোদ্যোগে কাজ করে
সেই জমি, সেই শিল্পোদ্যোগ ওরা পাহারা দেয়।
খাটে ওরা শ্রমিকের মতো দল বেঁধে, মজুরি পায় ;
কাজটার প্রকৃতি যদিও কৃষকের কাছাকাছি।
জমির সীমানা,
দেশের সীমানা,
চোখে দেখতে পাওয়া যায় যে সীমানা
সম্পত্তির কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা যে সীমানা
সেই সীমানা ওরা পাহারা দেয়।

মজুরির সীমানা ওরা পাহারা দিতে পারেনা।
মুনাফার সীমানাও না।
বাজারের অথবা বেকারীর
দামের অথবা আকালের
সংকট এমনকি সার্বভৌমত্বেরও সীমানা
ওরা পাহারা দিতে পারেনা
তাই ওদের বসবার স্থান
শ্রমিক ও কৃষকের মাঝামাঝি।

জমির লড়াইয়ে কৃষকের বক্তব্য কতটা স্থান পায়?
দেশের লড়াইয়ে সৈনিকের বক্তব্য ততটাই স্থান পায়।
মজুরি ও মুনাফার লড়াইয়ে
বাজার ও বেকারীর লড়াইয়ে
দাম ও আকালের লড়াইয়ে
সংকট ও সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ে
শ্রমিক যতোটা শ্রমিক হিসেবে জয়ী,
দেশের সীমানার লড়াইয়ে
সৈনিক ততোটাই শ্রমিক হিসেবে সৈনিক।

বহুকাল ওরা ঘরছাড়া।
দেশের সীমানায় ওরা কঠোর শ্রম করে চলে
পিছনে, ওদের অজান্তে দেশ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়।
শাসকের নির্দেশে ওরা যে দেশকে রক্ষা করতে ছুটে আসে
সে দেশ তখন কোথাও থাকেনা।
যে দেশকে বস্তুতঃ তারা রক্ষা করে
সে দেশ শাসকের দেশ।
শ্রমিক সেখানে দেশহীন হয়।

কৃষক সেখানে দেশহীন হয়।
সৈনিক সেখানে দেশহীন হয়।

কঠিন শ্রম করে ওরা।
শাসকের নির্দেশ মেনে মানুষের
মস্তিষ্ক কিম্বা শরীর থেঁতলে দিতে
নিছক পেটের তাগিদে কঠিন শ্রম করে ওরা।
মাঝে মাঝে
যখন জেলের গরাদ ধরে মুচড়ে ওঠে আশার
আঙুলগুলো
ওরা ছুটি পায়।
যে কোনো প্রবাসী মানুষের মতো
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ওরা বাড়ী ফেরে।
ফেরার সময়
নিজের ছোটো সন্তান কিম্বা ভাইয়ের জন্য
খেলনা নিয়ে আসে।
নিজেদের
ট্রিগার আর নামহীন লাশের গন্ধে ভরা হাতে
ওরা সেই খেলনাগুলো কিনে আনে।
দূর থেকে ওদেরও চোখে ওদের নিজেদের বসত
বৌয়ের খোলা বুকের মতো কাছে টানে।
ট্রেনের জানলা দিয়ে ওরা দেখে
পিছনে উধাও হতে থাকা প্রান্তর…গ্রাম…শহরের পর শহর
কত পরিচিত ওদের এই জায়গাগুলো।
কতবার এইসব জায়গায় ওরা হত্যা করেছে!
জানালার ঝাঁপ বাজিয়ে ওরা দেশোয়ালি ভাষায়—

যাদের হত্যা করেছে ওরা তাদেরই ভাষায় গান গায়।

ওরা কি ডাইরি লেখে ?
কি কথা হয় নিভৃতে
ওদের পরিবারের সাথে ?

চিরসবুজ জঙ্গল, মরশুমী হাওয়া আর কর্কটরেখীয় রোদে ভরা এই দেশ।
মানুষের আকাঙ্খার ওপর অবিরাম মৃত্যুবর্ষণের
ধূসর দিশাহীন অন্ধকারে
এ দেশের দশকগুলো হারিয়ে চলেছে।
তবু আদিম অরণ্যে জ্বালানো প্রথম আগুন
প্রাণের সত্তায় যে এক ফুলের সম্ভাবনা এনেছিলো
তার সবচেয়ে নতুন পাপড়িগুলো
ঘোষণাপত্র হয়ে ফুটে উঠছে সেই দেশগুলোর
যেখানে মেহনতী দুই হাত
প্রভুত্ব কায়েম করেছে মেহনতের লক্ষ্য ও সাধনের ওপর।
এদেশের আকাশের নিচেও বারবার
তার একটি পাপড়ি উন্মীলিত হতে চায়।

তখন বারবার
পিপাসায় উজ্জ্বল হয় রাত !
আর পিপাসায় উজ্জ্বল ওই রাতগুলোয়
এদেশের শাসকদের ঘুম ছুটে যায়...।
প্রশস্ত হলঘরে
গোলাপের ফুলদানির পাশে
ভোট, শস্য, কাপড়, ইস্পাত আর হিংসার ইজারার
আদান প্রদান করতে থাকা

ফ্যাকাশে, কাপুরুষ আর ফাঁসির দড়ির মতো মসৃণ নিঃশব্দ হাতগুলো
ঈষৎ কেঁপে ওঠে।
ব্যস্ততা বেড়ে যায় বিত্ত, গৃহ ও নানাবিধ মন্ত্রালয়গুলোয়।
আমাদের ঘরে নুন আরো নোংরা আসে
রুটি আরো কালো হয়,
ভাত দলা পাকিয়ে যায়, ঘরের যুবতী মেয়েদের
মাথার চুল ওঠে বীভৎস ভাবে,
জানালার কাঠে বন্যার গন্ধ ওঠে সারাবছর...
আর ওরা জন্ম নেয়
অস্ত্রসজ্জিত, সুন্দর, জলপাই আর মাটির রঙের কাপড় পরে।
টেলিফোন লাইনে ছুটে যায় হত্যার আদেশ আর প্রলোভন।
সার্চ লাইট, জিপ, আর টহলদারীতে ভরে যায় রাতের
ঘুমিয়ে থাকা শহর, মফস্বল আর গ্রামের এলাকা।
তীব্র আলো সহসা খুঁজে নেয়
দেওয়ালের কাছে—
ব্রাশ আর রঙের ডিবে হাতে নিয়ে দাঁড়ানো
একটি নতুন মুখ।
অনেক দিন পর বাড়ী ফিরে
মায়ের সাথে কথা বলতে থাকা
একটি শ্রান্ত কাঁধ।
লণ্ঠনের আলোয়
ভবিষ্যতের পাণ্ডুলিপি ঘিরে থাকা
কিছু উত্তেজিত হৃদয়।
জীপের ইঞ্জিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে থামে।
আর ওরা
এদেশের সশস্ত্রবাহিনীর লোকেরা

এগিয়ে আসে
আর স্বপ্নের কণ্ঠনালী চেপে ধরে।

কিভাবে তৈরি হয় ওই কণ্ঠনালী? স্বপ্নের?
ওরা কি জানে যে ওদের সঞ্চালিত করে যারা—
কত অসহায় তারা বস্তুত:?
যে ওই সহজ নিয়মটাকে তারা রদ করতে পারেনা, যাতে
যতো ভয়াবহ আকাল তারা হানে
ততোই সুন্দর ফল ও গরম দুধে ভরা সময়
তারা আনতে বাধ্য হয়
আকালপীড়িত মানুষের কামনায়।
যতো বন্যা ও খরা তারা হানে
ততোই বেশী সেচ প্রকল্প ও হাইডেল
তৈরী হয় বন্যা ও খরা পীড়িত মানুষের চেতনায়।
যতো বেশী অন্যায় তারা হানে
ততো নির্দিষ্ট হয় তাদের বিরুদ্ধে ন্যায়ের
বুনিয়াদ মজবুত করার জন্য জরুরী
ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সংগঠন ...

ওরা কি জানে যে ওদের সঞ্চালিত করে যারা
কত অসহায় তারা বস্তুত:!—
যে শ্রমের মুক্তির ইচ্ছা দমন করার জন্য তাদের
সবচেয়ে বেশী সংগঠিত, শক্তিশালী
ও সশস্ত্র শ্রমিকবাহিনীর জন্ম দিতে হয়?

দেবীপ্রসাদের "সাতমূর্তি"

ওরা বলেছিলো—"অত্যাচারী বৃটিশ! ভারত ছাড়ো!"
ওরা ভেবেছিলো এভাবেই
শ্রাবণের পুকুরে তাদের গ্রামগুলোর বিম্ব
বধূর লজ্জারুণ গোড়ালির মতো নামবে।
মকাইয়ের ক্ষেতের ভিতরে
গানের বোলে, শিশুদের মুখে
ফিরে আসবে মন্বন্তরে মৃত স্বজনেরা।
স্কুলের মাষ্টারমশাই
চশমা খুলে, চোখের জল মুছে,
ওদের কাঁধে হাত রেখে বলবেন—
"কতোজনে কত কিছু দেয়,
তোরা স্বাধীন ভারতবর্ষ দিলি, পৃথিবীকে,
আমাকে!"
ওরা ভেবেছিলো এভাবেই
রাস্তায়, ট্রেনে যে কোনো মানুষের চেহারায়
যে কোনো মুহূর্ত্তে
কয়েক হাজার বছরের আলোছায়া খেলে যাবে।
যে ফসল আর রেলের চাকা ঘোরায়
সে, দেশের চাকা হাতে নেবে।

হয়তো ওরা এসব কিছুই ভাবেনি,
শুধু আলোড়িত এক স্বপ্নের ঘোরে
যৌবনের অদম্য সাহসে এগিয়ে গিয়েছিলো।
কিন্তু ওদের যাওয়া
সেই বিশিষ্ট স্থান আর কালে
এই সমস্ত কথাকে ধারণ করেছিলো।
ভগৎ সিং'এর অনেক পরে ওরা যুবক হয়েছিলো।
কিষাণ সভা গড়ে ওঠার পরে ওরা কৃষকের ঘরে বড়ো হয়েছিলো।

বৃটিশ গুলি চালালো।
ওরা এক এক করে
আমাদের রক্তে লীন হয়ে গেল।...

আমরা তা ভুলে যাই।
তখন শিল্পীর কাজ শুরু হয়।
তিনি রঞ্জন রশ্মি ফেলেন আমাদের ওপর।
আর তখন চোখের সামনে হাওয়ায়
ফুটে ওঠে
আমাদের রক্তের অন্তর্ছবি—
সাতটি শরীরের ব্রোঞ্জ।

হয়তো তিনিও
বেশী কিছু ভাবেন না।
শুধু অতীতকে গাইবার জন্য কাজ করেন।
কিন্তু তাঁর ওই কাজ করা,
ওই বিশিষ্ট স্থান আর কালে
আমাদের অন্য কিছু মনে করায়।

আমরা দেখি
শ্রাবণের পুকুরে গ্রামগুলোর বিম্ব—
কোথায় ?
নেই ! উজাড় হতে চলেছে।
মন্বন্তর

রাজধানীর রাস্তায়

রোজ গাড়িতে বসে
অর্থমন্ত্রক, চেম্বার অফ কমার্স, বিধায়কদের
ফ্ল্যাটে আর পাঁচতারা হোটেলগুলোর কামরায়
আসা যাওয়া করছে।
গানগুলো মালিকের হৃদয় পরিবর্ত্তন করতে করতে
চরিত্রহীন হয়ে গেল।
মাষ্টারমশাই অনশনে বসে আছেন একত্রিশ বছর ধরে—
স্ত্রী মারা গেলেন গর্ভাশয়ে ক্যান্সারে,
মেয়ে কার্বোলিক খেয়ে চলে গেল—
চশমার ফাটা কাঁচে ধরের ধূলো উড়ছে।
তেরঙা থেকে ঝরে পড়া ফুলের পাপড়ির নিচে
বিমান থেকে ঝরে পড়া তেরঙা আবীরের নিচে
চকচক করছে
ফসল আর রেলের চাকা ঘোরানো মানুষটির
রক্তলাগা বেয়নেট, রাইফেলের কালো নল।
আমন্ত্রিত জনসমুদ্রের মাঝ দিয়ে
স্বাধীনতা
একটি রহস্যময় ধূসর অবতারের মতো চলেছে
আর তার পেছনে
ভাড়া খেটে নাচতে নাচতে চলেছে

ভারতীয় সংস্কৃতি।

হয়তো ওরা
যারা নাচছে, যারা মার্চ করছে, যারা 'দেশের গৌরব'
উপাধি পাচ্ছে,
ওরা এসব কিছুই জানেনা, ওরা
বস্তুতঃ স্বাধীনতার গর্বে ও আনন্দেই এসব করছে,
কিন্তু ওদের এই সমস্ত কিছু করা,
এই বিশিষ্ট স্থান আর কালে,
মুখ ভাঁড়ামোর চেয়ে বেশী কিছু নয়।

আমরা বলিনা আর—"ব্রিটিশ! ভারত ছাড়ো!"
আমরা বলি—
"মৃত পুঁজিবাদ! পৃথিবী ছাড়ো!
ভারত ছাড়ো!
যে সরকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে না,
যে সরকার স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয় পিছনের দরজা দিয়ে
যে অর্থনীতি গোলাম করে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ববাজারের,
সে সরকার, সে অর্থনীতি, নিপাত যাক!"
কিন্তু একথাগুলি বলার জন্য
কিভাবে দাঁড়াতে হবে, তা শিখতে
ওই সাতটি ব্রোঞ্জের কাছে গিয়ে দাঁড়াই।
শীতের রাতে, মিছিল ফেরতা
ওই ব্রোঞ্জের আঙুল বেয়ে ঝরা তড়িৎ বিন্দুর মতো শিশিরে
করতল ভিজিয়ে নিই।

স্বপ্নে যদি ভুলও থাকে,

তাতে স্বপ্নের জন্য প্রাণ দেওয়া সহজ হয়না একটুও।

ইউনিয়ন জ্যাকের বিরুদ্ধে যারা
তেরঙাকে তুলে ধরেছিলো
তাদের থেকে আমরা শিখে নিই
পৃথিবীর সব রঙের মিথ্যা ব্যবহারের বিরুদ্ধে লাল
পৃথিবীর সব রঙের মুক্তির জন্য লাল
কিভাবে তুলে ধরতে হবে।

যদি মৃত্যু কালো ঝড়ের মতো ঘিরে নেয়
কিভাবে শিশুদের রক্তে মিশে যেতে হবে।

মার্কসের "ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল"

আসানসোল। রাত।...
কুড়ি হাজার ভোল্টে ফুলকি ছুটিয়ে
কলকাতা থেকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ হয়ে দিল্লীর দিকে
মিলিয়ে গেল শেষ ট্রেন।...
যদিও ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ রেল স্টেশনে এর পরেও
(যুদ্ধ নেই তবু) প্রায় যুদ্ধকালীন বিস্রস্ত ভীড়।
আর তাছাড়া
বেশীর ভাগ ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের ওপারে অন্ধকারে
বুর্জোয়া যোজনার বাদলাঘাট
কালো জল নিয়ে ফুঁসছে
আর বেশীর ভাগ ফিসপ্লেট ঢিলে হয়ে আছে ভারতের
সংবিধানের কোনো না কোনো একটি ধারার সুবিধাবাদে।

জি. টি. রোড।
একের পর এক মাল বোঝাই ভারী ট্রাক
এগিয়ে এসে
শান্তির ক্ষণিক নীরবতা পিছনে রেখে মিলিয়ে যাচ্ছে।
যদিও তারপর হাইওয়েগুলো ভেঙে

ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেছে বিভিন্ন বিকাশ কার্য্যক্রমের
শরিকদের বাড়ীর দেওয়ালে কিম্বা লকারে।
বন্দরে পচছে রসায়ণ, যন্ত্রপাতি ও শেক্সপীয়র রচনাবলী,
কেননা বাজার নেই।
কেননা আরো বেশী শ্রম নিংড়োতে দেওয়ার শর্ত ছাড়া
মালিকেরা ওগুলো খালাস করাবে না আর
শ্রমিকেরাও আর সে অবস্থায় নেই
যে বিনা বাধায় তা হতে দেবে।

গুদামে পচছে শস্য।
হাতের আঙুলের জোড়ে অনেকগুলো বসন্ত বৃথাই টাটিয়ে যাচ্ছে।

ওই রেললাইন ও হাইওয়ের দুধারে প্রদেশের পর প্রদেশ
সেই অবধারিত খাল।
যদিও হয় কিছুতে জল নেই, নয়তো বেশী জলে
খাল ক্ষেত একাকার বা জল ঠিকমতো থাকলেও
লাঠিয়ালের জায়গায় বন্দুক এসেছে আর
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুমিরের রঙ পাল্টেছে
ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধনের সাথে সাথে।

সারাটা ভারতবর্ষ আজ উপগ্রহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
সারাটা ভারতবর্ষ আজ
ছোটো ছোটো উপগ্রহ আর বিক্ষিপ্ত গ্রহাংশে
পরিণত হতে চলেছে।
নিঃসন্দেহে একান্ত জরুরী ভারতবর্ষের একতা।

আর তারই জন্য একান্ত জরুরী
শোষক ও শোষিত ভারতবর্ষের পরিষ্কার বিচ্ছিন্নতা।

সীমান্ত বিহারে ইউনিয়ন ট্যুর সেরে এসে
সীমান্ত বাংলার একটি শহরে
হোটেলের ভাঙা ঝুলধরা জানালার ভিতরে ঘরে
আমরা—
আমি ও আমার হিন্দীভাষী সাথী
নিচুস্বরে আলোচনা করছি—
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত ভাবে
দেশের ও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক গতিতে হস্তক্ষেপ
ত্বরান্বিত ও ব্যাপকতর করার
আশু কার্য্যসূচী।

আসানসোল। রাত।
মানুষের পায়ের ছাপ নিয়ে আধা-চাঁদ
ঈষৎ কুয়াশাচ্ছন্ন অক্টোবর শেষের আকাশে।

আজকের দিনটার জন্য

আজকের দিনটার জন্য একটা দিন
ইতিহাসের পাতায় আমি খুঁজছি,
আজকের তারিখটার জন্য একটা তারিখ ?
সামান্য হলেও ক্ষতি নেই ;
হয়তো লেনিন
একটা ছোট্টো জরুরী চিরকুট
আজকের তারিখে লিখে
শিক্ষার জনকমিসারিয়েটকে পাঠিয়েছিলেন…

আজকের দিনটা নীল, উজ্জ্বল—
অসংখ্য কাজে ব্যস্ত হবে প্রত্যেকটা প্রহর।
আমি সেই প্রহরগুলোর জন্য একটা নাম
চাইছি, যেমন কবিতা একটা নাম চায়…

আজকের দিনটা ফ্যাকাশে, বিবর্ণ—
অসহায়তায় ফেটে প্রত্যেকটা প্রহরের কার্বলিক
আশার কণ্ঠনালী কালো করে দেবে…।
আমি সেই প্রহরগুলোর জন্য একটা নাম চাইছি
যেমন বিদেশ বিভুঁইয়ে সন্ধ্যায় একটা ছিন্নমূল পরিবার
একটা দেশ চায়…

আজকের দিনটা যেমন তেমন—
কিছু কাজ কিছু অকাজ কিছু অর্থহীনতায়
অদৃশ্য হবে প্রহরগুলো।
আমি এই প্রহরগুলোর জন্য একটা নাম চাইছি যেমন
সংশয়গ্রস্ত মন
প্রেমকে দু'হাতের আলিঙ্গনে বন্দী করে রাখতে চায় চিরকাল…

আজকের দিনটার জন্য একটা দিন
ইতিহাসের পাতায় আমি খুঁজছি
আজকের তারিখটার জন্য একটা তারিখ

ঠিকানা ঃ পাটনা—৮০০০……

এ শহরে জন্ম হলো।
মাঝের কয়েকটি বছর দু'একটা ভিন্ন শহর—
দু'একটা ছোটো গল্পের জন্য বাদ দিয়ে
কিম্বা কয়েকটা ছোট্টো লিরিক ;
এ শহরে আঠাশ বছর ধরে আছি।
আজও কি এই শহরের কবি হতে পেরেছি ?

কুয়াশার রাত্রে হঠাৎ—"বিদ্যুৎ !"
বলে ডাক ওঠে পুরোনো মোহল্লার ঝিমিয়ে পড়া মোড়ে।
ঘুরে তাকাই।
এ শহরের আঠাশ বছর
দেখি রিলিফের মাল ছেঁড়া বিলিতি সার্জের কোট পরে
উঠে আসে
পুরোনো বাড়ীর বেসমেণ্টের ভাঙা চাতাল থেকে
—"কেমন আছো ?"
—"ভালো আছি।"
শুধু এ শহরের দিগন্তে আজো কোনো পাহাড় এলোনা,
স্বপ্নের টেলিগ্রামগুলো পকেটে নিয়ে ঘুরছি—
আজও সাঁটা হলোনা দেওয়ালে।

শহরের কোনো এক দিগন্তে পাহাড়—

অন্ততঃ ছোটো মাটিরও একটা
একটা কিছু উঁচু, যাতে চড়ে
শহর পেরিয়ে দেখা যায়,
সূর্যকে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছেই ধরে ফেলা যায়,
লাফিয়ে উঠে পড়া যায় জানালা দিয়ে সেঁধিয়ে
দিনের খালি কম্পার্টমেণ্টের নীলচে করিডোরে—
অত্যন্ত জরুরী।
এতে প্রেম আর শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

এক সময়
একটু বেশী ভাবপ্রবণ ছিলাম।
একসাথে নিয়ন্ত্রণ করতাম ভবিষ্যতের
সেচ, বন, নগর-বিকাশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জনকমিসারিয়েট।
পুরো শহরটা ঢেলে সাজাবার ব্লুপ্রিণ্ট তৈরি করেছিলাম—
কালিনিন-প্রসপেক্টটাকে মডেল হিসেবে রেখে।
শেষে আমার
ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে
শহরকে সুন্দর করতে বুলডোজার এগিয়ে এলো।
আমার এক বন্ধুর ঘর বস্তীতে,
সেই বস্তী ভেঙে দিলো।
তার ছোটো ভাই মারা গেল শীতের রাতে, সেই রাতে
আমার সমস্ত বিভাগ
দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল,
বুলডোজার আর হাহাকার—তুমি কোনদিকে যাবে?

বুলডোজারের দিকে যাওয়ার কোনো উপায় ছিলোনা।
আমি সেদিন এই শহরের ভাঙা গলিগুলোর কাছে
অনেকক্ষণ ক্ষমা চেয়েছিলাম।
তবু বুলডোজারের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে একদিন।
বুলডোজার কার! কোনদিকে যাওয়ার!
পাহাড়ের সাথেও বোঝাপড়া করতে হবে।
কবে হবে! কিভাবে হবে!

২

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন—"শহরের কবি?"
শহরতো কোনো 'বাদ' নয়!
শিল্পতত্ত্বের কোনো ধারা নয়!
হ্যাঁ! শহরের কবি।
আপাততঃ রাজনৈতিক সুক্ষ্মতায় যাচ্ছিনা,
আপনার লাইন ঠিক কি আমার…।
যে লাইনেই থাকুন
এটাতো মানবেন যে জীবনের সুন্দর দিনগুলো আনার
বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে
যেমন দেশ একটা ফ্রন্ট;
তেমন দেশব্যাপী লড়াইয়ে—ক্লোজ-আপ লেন্স লাগিয়ে দেখুন—
শহর একটা ফ্রন্ট।
লড়াই চলছে।
শত্রুপক্ষ আর মিত্রপক্ষ দুই-ই হাজির।
হার্ডিঞ্জ রোড আর বেলী রোডে মাঝে মাঝেই
দীঘা গুমটি দুটোর কাছে

সামনা সামনি হয়।
বাস আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে ব্যারিকেড তৈরি হয়।
ময়দান থেকে শুরু করে ইউনিয়ন অফিস, পার্টি অফিস,
হলঘর থেকে শুরু করে চায়ের দোকান, গোপন আড্ডা,
আর এম. এল. এ ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে 'রিপাব্লিক,'
'প্রেসিডেন্ট', 'পাটলিপুত্র', কিম্বা 'মৌর্য্যের' কনফারেন্স রুম অব্দি—
প্রায় প্রতিদিনই
দু'পক্ষের জেনারেল আর সৈনিকদের মাঝে
ফর্মাল মিটিং আর ইনফর্মাল গেট-টুগেদার হয়।
তৈরি হয় ডিফেন্স আর অফেন্সের কার্য্যসূচী।

তা আমি সেই দু পক্ষের এক পক্ষে আছি
(কোন জলের মাছ তা কবিতাই বলবে)
ডাগ-আউটের ভিতরে বসে নিজের ডাইরিতে লিখতে চাই,
এই ফ্রন্টের ভূতত্ত্ব, আবহাওয়া
গাছগাছালি, পশুপাখী,
ঘরবাড়ী, মোহল্লা, বাজার, কারখানা, মানুষেরা।
মানব মস্তিষ্কের যতেক সুগন্ধ, যথা
ভালোবাসা থেকে আন্দোলন
নৈঃশব্দ থেকে গান।
মানব মস্তিষ্কের যতেক দুর্গন্ধ, যথা
দয়া থেকে হত্যা, করুণা থেকে ব্যাভিচার
মন্দির মসজিদ থেকে কোকতত্ত্ব আর
ব্যাঙের বংশবৃদ্ধি থেকে
'বাকস্বাধীনতা' জিন্দাবাদ।...
দেখুননা ডাইরি উল্টে—পিছনের পাতাগুলোয়
সেই পঁয়তাল্লিশে রুমানিয়ার এক গ্রামে

দুপুরে বসে লিখেছিলাম সেই মহান বসন্তের কথা।
তারও আগে
বলশেভিকদের কাছে শিখতে গিয়েছিলাম সতেরোয়
ইন্টারন্যাশনালিস্টদের সাথে।
ইউক্রেনের একটি অঞ্চলে বসে
কাঁচা হাতে অনেক কিছু অনেক পাতা ভরে লিখেছিলাম।
কেননা ওখানেই
ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমার বাবা, মা, ভাই, বোনের
নাম পেয়েছিলাম—
বাবা, মা
আঠারোশো আটচল্লিশের ব্যারিকেডে মারা গিয়েছিলেন,
আমার দুই বোনও একের পর এক
পতাকা হাতে আহ্বান জানিয়েছিলো সাথীদের
আর গুলিবিদ্ধ হয়েছিলো,
ভাইটা
শেষ কম্যুনার্ডদের সাথে পড়েছিলো গোরস্থানের দেওয়ালে।
দাদুর ছবি পেয়েছিলাম ইংল্যাণ্ডের একটা কাঠ খোদাইয়ে
একজন বৃদ্ধ চার্টিষ্ট!
কাঠের সাঁকোর ওপরে, জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।
মা নাকি বলতেন
আমার আরও দু'একটা ভাই ছিলো।
কে কোথায় ছিটকে পড়লো,
আমি এসে বড়ো হলাম এই ভারতবর্ষে—
হাওড়ায় সেই প্রথম হরতালের সময় থেকে,
আর তারপর থেকে এখানেই আছি, এখানেই
সারা দুনিয়ার সাথীদের সাথে

কদম মিলিয়ে চলা শিখেছি, গান গাওয়া,
বৃটিশের বিরুদ্ধে রেলের চাকা জাম করার থেকে, ইদানিং
কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বোট ক্লাবে মিছিল নিয়ে যাওয়া,
এত তর্ক, এত জেরবার, এত রক্তপাত
বিপ্লবের পথ খোঁজার দ্বন্দ্বে...

এই রক্তপাত, এই দ্বন্দ্বের কোনো একদিক নয়
এই পুরোটা দ্বন্দ্ব আমার—
এই দেশ, এই উপমহাদ্বীপের ঝড়ের নুন
আমি ভালোবাসি।

থাক ছাড়ুন ওসব কথা।
মায়াকভস্কি বলেছিলেন না?
বলশেভিক কাঁদছে
এটা একটা মিউজিয়ামে রাখবার মতো আজব দৃশ্য!

তাছাড়া এতগুলো দশক তো কেটে গেল এদেশেরও!
কি করতে পেরেছি, কি করতে পারিনি,
কিভাবে করা উচিৎ
সেটা বরং শান্ত মনে ভেবে দেখা বেশী দরকার
এভাবে অস্থির হওয়ার থেকে।
এ মঙ্গলময় ঈশ্বরের দেশ।
বার বার
আশা জেগে ওঠে, কখনো রাশিয়া কখনো চীনের নামে
কখনো তৃতীয় দুনিয়ার!
আন্দোলন শুরু হতে না হতেই

পার্লামেন্ট ষ্ট্রীটে রেড ফিল্ডগানের ঘর্ঘর
কানে বাজতে শুরু করে।
মধ্যরাতের ঘোষণার মুসাবিদা তৈরি শুরু হয়ে যায়।...
কিন্তু আজও—
সবকিছু সত্ত্বেও নিজের দুর্বলতা স্বীকার করছি—
এদেশটাকে হাতে তুলে ওজন করতে পারলামনা
যুক্তির পাল্লায়
থাকবে? না জলে ডুবে যাবে?
কি কি পদার্থ দিয়ে তৈরি এ জিনিষটা?
যাকে দেশ বলছি?
আর তাই এ প্রশ্ন করছি আজ
আমি কি এই শহরের কবি হতে পেরেছি?
আপনি?
নিজের শহরের? কিম্বা জেলা সদরের?
শহরতলীর? নিজের পঞ্চায়েত কিম্বা ব্লক এলাকার?

৩

আমি জানিনা কোনোদিন
ইস্‌সিক্‌কুলের মতো কোনো হ্রদের ধারে গিয়ে
চিৎকার করে বলতে পারবো কিনা—
"আমার গান এখনো শেষ হয়নি ইস্‌সিক্‌কুল!"
একটা প্রাচীন নদী আছে বটে এ শহরের ধার দিয়ে
কিন্তু তার সাথে কোনো কথা বলা মুশকিল।
বন্যা ও খরা ছাড়া বহুকাল সে আর চোখে পড়েনা

তাছাড়া আমার গান শুরুই কোথায় হয়েছে যে
শেষ হয়নি, তার বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করবো ?

মাঝে মাঝে
রাস্তার মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে আমি শহরটাকে যাচাই করি
বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে।
কখনো প্রাচীন পাটলীপুত্রকে নামাই
অশোক রাজপথে বৌদ্ধ পরিব্রাজকের পায়ের ধুলো উড়িয়ে।
কখনো শ্রীকান্তের সাথে রাজলক্ষ্মীর বাড়ী থেকে ফিরি।
কখনো যদুনাথ সরকারের সাথে পাটনা কলেজের
ইতিহাস বিভাগে গিয়ে বসি।

কখনো ঝাউগঞ্জ,
খাজে কলাঁ, পথর কী মসজিদ থেকে ওদিকে রূপসপুর গ্রাম অব্দি
ফের নতুন তৈরি আসাম দিল্লী হাইওয়ে থেকে প্রায়
দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট

ওদিকে ফুলওয়ারিশরীফ...
এই শহরের ছোটো বড়ো মোহল্লাগুলো
তার পুরোনো নোংরা অন্ধকার বাড়ীঘর
জলকাদায় ভরা গলি
ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াই।
ইলিয়টের প্যারডি করে একসময় বলতে পারতাম—
"প্রাইভেট সেক্টর থেকে পাব্লিক সেক্টরে পুঁজি আসে যায়—
ভারতবর্ষের উন্নতির কথা বলে।
দরিয়াপুর গোলা, মন্দিরি, সালিমপুর আরহরা
টিমটিম করে জ্বলে।

রাস্তার কলে ঝগড়া বাঁধে,
বাচ্চারা কাঁদে,
ছেঁড়া টুকরো টুকরো দিনরাত বছর পেরিয়ে যায়,
পরবের রাতগুলোয় হত্যা হয়
খুব ছোটো ছোটো কারণে
পুরোনো সরু গলিগুলো থেকে পচাটে হাওয়া ওঠে ইতিহাসের
ক্ষয় ধরা ফুসফুস থেকে যেমন…
একজন বৃদ্ধ রিক্সাচালক ঘুঁষিতে রক্তাক্ত মুখ নিয়ে
বিমূঢ় ভাবে কাঁদে অশ্বত্থ গাছটার নিচে……"
কিন্তু আর না।
ওসব নিওরিয়্যালিজ্‌মে কোনো কাজ হয়না।
আর তাই
বেশ কিছু বছর হলো গভীর রাতের
নীল নিঃশব্দ ডায়ালগুলোয় ঘোরা ছেড়ে দিয়েছি।
এমন নয় যে ব্যাপারটা খারাপ।
শেষ রাতে স্টেশনের চায়ের দোকানে বিস্কুট
অনেকের সাথে খেয়েছি।
ভ্যানগগের সাথে, ঋত্বিকের সাথে…
ব্রুগেলকে নিয়ে রেণাঁশাঁর সাথে লড়েছি
হিকমতের সাথে পেরিয়েছি এশিয়ার
একটি শহরের ওভারব্রীজ…
আজও ঘুরতে ইচ্ছে করে ;
কতোজনকে নিয়ে গিয়ে দেখানো হলো না রাত তিনটেয়
প্রথম খবরের কাগজ ফেরি করা বাচ্চা ছেলেটির মুখ।
তাজা কাগজ—হাত ঘষলে প্রেসের কালি উঠে আসে।
তাজা মুখ—

ঠোঁট ঘষলে আমাদের অনেক বাতেলার দাগ উঠে আসে।
কিন্তু সময় নেই।
কাজ এত বেশী আর করতে পারছি এত কম
চাঁদনিতে বেশীক্ষণ দাঁড়ালে মনে হয়
হাড়ে রেডিও কার্বন জমবার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

8

কত কিছু জানতে হবে আর কত তাড়াতাড়ি।
কত কিছু করতে হবে আর
এগিয়ে আসছে আবার একটা রাজনৈতিক সংকট।
একসময় লিখেছিলাম—
"যত দিন যাচ্ছে তত কঠিন হয়ে পড়ছে বলা—
আমার দেশ।"
তখন বুঝিনি তার তাৎপর্য্যটা পুরোপুরি।
লিখেছিলাম—
"কে জানে মাদলকে মাদল বলতে চাওয়া
আমার কণ্ঠনালীকে কতটা গড়েছে!
হয়তো আমার এ উচ্চতাও
আমের মঞ্জরী ছোঁওয়ার জন্য হয়েছিলো।"
এখন দেখতে পারি—
মাদল, কণ্ঠনালী, আমের মঞ্জরী, উচ্চতা ও আমার দেশ
পাঁচটা শব্দের পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে শত্রুর
পাঁচ রকমের ভাঙনের রাজনীতি।
এখন দেখতে পারি যে একটু বেসামাল হলেই
পাঁচ রকম ভাঙনের রাজনীতির গোপন কামরায়

ভাড়াটে সঙ্গমের খেল দেখাতে লেগে যেতে পারে
মাদল, কণ্ঠনালী,
আমের মঞ্জরী, উচ্চতা,
আমার দেশ,
তথা এমনই আরো শব্দগুলো
ঘর্ম্মাক্ত, ক্লান্ত, করুণ আর কালসিটে পড়া চেহারায়।

৫

বিকেলে গোলামী থেকে খালাস পেয়ে
ইউনিয়ন অফিসের দিকে যাই।
কমরেডের সাথে দেখা হয়।
—"কি হলো কালকের মিছিলে 'ক' সংগঠনের
ব্যানার দেখলামনা যে?"
—"না! 'চ' গ্রামে পরশুর হত্যার ঘটনাটার
প্রভাব পড়েছে ওখানে। লীডারশিপ
নিজেদের মধ্যে লড়ে গেছে জাতের ভিত্তিতে।
'ব' গ্রুপটাকে দিয়ে চাপ দেওয়াতে হবে ওখানে। নইলে
ইউনিয়ন ভেঙে যেতে পারে।...আরে হ্যাঁ শুনুন!
অস্ত্রভস্কির 'ইস্পাত' বইটা আছে আপনার কাছে?
দিননা। আরেকবার পড়বো ভাবছিলাম।"

বিজ্ঞান ভবনের পিছনে সূর্য্য নেমে যায়।
ময়দানের অন্ধকার খাঁজগুলোয়
মেয়েরা মরে। বেশ্যারা জন্ম নেয়।

আমি ও আমার কমরেড
ঘুরতে ঘুরতে আলোচনা করি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা
তোলার অর্থাৎ জাত দিয়ে জাত ভাঙার
কালকের কার্যাক্রম ও তারই সাথে
বাবুশকিনের জীবন।.....

তাই তো বলছিলাম—
এ শহরে জন্ম হলো,
এ শহরে আঠাশ বছর ধরে আছি,
আজও কি এ শহরের কবি হতে পেরেছি?

খোঁজ

একটা দিন হয়।
ক্যালিগুলার ভেঁপু বেজে ওঠে।
কয়েক কোটি মানুষ—যে কোনো একটি মানুষ
তার জীবনের অপমানের বিনিময়ে গড়তে শুরু করে
জীবনের প্রতি তার গৌরবময় অধিকার।

কাজের প্রথম ঝোঁকটা কেটে গেলে
কথাবার্ত্তাও শুরু হয় ইতস্ততঃ।
কাজের ফাঁকে ফাঁকে
আমার আপনার বিগত ব্যক্তিগত রাত ও সকাল
আমার আপনার সকলের হয়ে ওঠে।
কথা জারি থাকে।
দুপুরের বিরতিতে, চায়ের দোকানে, ফুটপাথে,
বিকেলের মিছিলে, সমাবেশে,
বা হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া যেকোনো জায়গায়
সিনেমা হলে, বাসে, বাজারে, ডাক্তারের ক্লিনিকে।
বিভিন্ন প্রসঙ্গ ওঠে, আলোচনা হয়,
চারপাশের দুনিয়া তৈরি করে চলে সেই আলোচনার
নিত্য নতুন রসদ।
প্রত্যেকটি মানুষ তার চিন্তার সমর্থন খোঁজে
যাতে জীবনে সে শক্তি পেতে পারে

যা জীবনকে শক্তি দিয়ে আনন্দ পেতে পারে।
কথা কখনো বাঁধে, কখনো বাঁধতে পারে না
বেশীর ভাগ হলুদ পাতার মতো ওড়ে
আরো বিষণ্ণ করে।...
... ...
তবু কথা চলে।
কথা জারি থাকে কেন না
আমার আপনার দুঃসময় একে-অন্যের হলে
তা সুসময়ের একটি বনিয়াদ।

২

আন্দোলনের দিনগুলো আসে।
বাইরের ঘটনাগুলো নিয়ে যে যা খুশি বলুক
তার আসল পরিচয়টা যাচাই হয় এই দিনগুলোয়

কেউ নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে
বড় বেশী চিন্তিত, কিন্তু
মিটিং-এর বিকেলটায় তার
বাড়ীর একটা 'জরুরী কাজ' মনে পড়ে যায়।
কেউ কোনো কিছু নিয়েই চিন্তিত নয় তবু
মিটিংগুলোয় খুব বেশী করে থাকে
বিশেষ করে নেতৃত্বের কাছ ঘেঁষে—
তাড়াতাড়ি পড়ে নেয় বিগত সার্কুলারগুলো
ভাষণ দেয়

চোখ কাড়ে বড় নেতার, কেননা
তার নিজের একটা কাজ তাকে করিয়ে নিতে হবে।
কেউ খুব-বেশী প্রশ্ন করে।
সব কিছুতেই তার সন্দেহ—
সন্দেহ একটা অজুহাত তার ভয়ের।
যে কাজে পুলিশের মারের,
চাকরী খোয়াবার ভয় আছে, সে কাজে
হাত না লাগাবার।
কেউ সবকিছুই নির্বিকার নিশ্চিন্ত মনে করে যায়।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়
সরকারের উঁচু তলায় তার নিজের লোক আছে।
তবু এরই মাঝে খোঁজ জারি থাকে—যাচাই
চরিত্রের,
কেননা যে সত্য আমার, আপনার,
সে সত্যের পথে আমাকে ও আপনাকে আসতে হবেই।
আজ না হয় কাল,
পুরো না হয় আংশিক, তা বলে নির্জনতায়
মুক্তি আমারও নেই,
মুক্তি সত্যেরও নেই।

৩

কথা ও কাজের সূত্রে
দিনগুলো এগিয়ে চলে।
সকলের রাত দিন, চব্বিশটা ঘণ্টা
কেউ একলা হাজার চেষ্টায়ও জানতে পারেনা।

কবে বলা কোন কথা
কার মনে কি ছাপ ফেলে রেখেছে
কবে করা কোন কাজ
কার মনে কি স্মৃতি তৈরী করেছে
আমরা সবসময় জানতে পারিনা।.....

আর একদিন হঠাৎ কেউ একটা প্রশ্ন করলো এমন—
আমি চমকে উঠলাম বা কেউ একটা উত্তর দিলো এমন—
চলতি প্রশ্নের—
যাতে চোর ধরা পড়ে গেল আমারই মনে।
কেউ বুঝলো না, কেউ হেসে উড়িয়ে দিলো,
কেউ চেপে দিতে চাইলো তীক্ষ্ণ ধূর্ত্ততায় কিন্তু
সাড়া জাগলো কারুর চোখে।
আশার একটা উজ্জ্বল বিন্দু
সুপারনোভার স্পন্দনে বিচ্ছুরণ শুরু করলো আলোর—
"তাহলে আরেকজন ?
তাহলে আরেকজন ?".....

এরপর যা হয়—অসফল সংকেতকে বাদ দিয়ে—
তা আজকের জীবনের
একটি মহত্ত্বম ও জটিল কাহিনী...।
লেখকদের আহ্বান জানিয়ে
আমি শুধু এটুকুই বলছি—
যে এগোয়, সেই জানে,
কতো দুরূহ পরীক্ষার মাঝ দিয়ে তার বয়স
কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর বয়স হয়ে ওঠে।

8

একসাথে কাজ করি—সংগঠনে আমরা কমরেড।
এক আন্দোলন গড়ে তুলি
বিভিন্ন ক্ষেত্রের দাবীগুলো একসাথে নিয়ে এসে—
সেই মোর্চায় আমরা কমরেড।
হয়তো এক পার্টিতেই আছি—
এক সেলে কিম্বা ভিন্ন সেলে—
ভাবধারা, লক্ষ্য ও কার্য্যসূচীতে আমরা কমরেড।
কিন্তু এই এগিয়ে যাওয়া
তার থেকেও বেশী! এই খোঁজ
ওই ভাবধারার পিছনের নিতান্ত ব্যক্তিগত রাস্তায়
হাতে হাত ধরে হাঁটা,
প্রেমিক যুগলের মতো অধিকারে। এই অধিকার—
যেমন প্রেমিকা দেয় তার প্রেমিককে নিজের গর্ভের স্পন্দন
কান পেতে শুনতে। এই একতা
উত্তরের নয়—উত্তরের ফাটলগুলোর।
একতা প্রশ্নের।
একতা সংশয়ের।
একতা স্বপ্নের।

তাই কথা শুরু হয়—আবার—কিন্তু নতুন মাত্রায়।
বিভিন্ন সমস্যা,
যতটুকু জানে তারা, একে অন্যকে বোঝাতে পারে।
যেখানে বোঝাতে পারে না
বিশ্বাসের হাত বাড়ায়।
সত্যকে একসাথে খুঁজবার আহ্বান জানায়।

ইতিহাস থেকে পাওয়া স্বপ্ন ও গানের সাহায্য নেয়।
অতীতের সব বেদনার
গোধূলির নদীর ওপার থেকে ডাকে।
ব্রুনোর শরীর জ্বালানো আগুন...
স্পার্টাকাসের দলের শেষ যোদ্ধার
মৃত্যুর আগের উচ্চারণগুলো,
ক্যাভাইনাকের সৈন্যের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানো শ্রমিকের
হাতের বারুদের দাগগুলো
শেষ কম্যুনার্ডদের রক্তে ভেজা গোরস্থানের ভাঙা ইঁটগুলো
অথবা চীন-ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মৃত কৃষকের চোখের
শূণ্যতার ছোপগুলো
এসবই রঙ হয়ে ওঠে তাদের সংশয়দীর্ণ সন্ধ্যার।...
আবার
কাম্পানেল্লার সূর্যের শহরও তাদের শহর হয়ে ওঠে।
ডেভিড যা স্পার্টাকাসকে বলেছিলো
তা তারাও মন দিয়ে শোনে।
তারা আবার ভাঙে ব্যাস্টাইল।
সাইলেসিয়া লিয়ন্সের ব্যারিকেড তারা গড়ে।
তারা বেঁচে থাকা বিস্মৃত কম্যুনার্ড হয়—
এবার আর ব্যাঙ্ক তারা ছেড়ে দেবেনা প্রাক্তন ডিরেক্টারদের
হাতে,
জহ্লাদদের তারা ক্ষমা করবেনা।
তারা রোমাঞ্চিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়
দুনিয়া কাঁপানো দশটা দিনের রাশিয়ায়,
তারা ক্রেমলিন অধিকার করে,

তারা দূর উত্তর সাগরের কাছে একটি গ্রামের মোড়ে দাঁড়িয়ে
ঘোষণা করে লেনিনের লেখা
শান্তির ডিক্রী।
জমির ডিক্রী।
শ্রমজীবী জনতার অধিকারের ডিক্রী।
শ্বেত আতঙ্কের বিরুদ্ধে গণভিত্তিক
লাল আতঙ্ক ছড়াবার ঘোষণা।...

তারা এগোয় একে অন্যের কাছে।
ধাপে ধাপে, যাচাই করে,
মাঝে মাঝে ফিরে যায়।
ঝগড়ায় কথা বন্ধ থাকে সাতদিন, আবার আসে।
হাজার পিছুটান, ভয় ও সুরক্ষার চিন্তা কাটিয়ে
কম জানার খোলস ভেঙে, জানার
আগ্নেয় অশান্তির দিকে।
একে অন্যের তারা শিক্ষক।
কেউ বেশী অশান্ত হয়ে ওঠে। তাকে শান্ত করে অন্যজন।
কেউ শান্তির আড়াল খুঁজে নেয়। তাকে খুঁচিয়ে বার করে অন্যজন।
কোত্থেকে শুরু করবো?
বড়ো কঠিন প্রশ্ন।
লিওন্তিয়েভ? না সোজা ক্যাপিট্যাল?
ষ্টালিন? এমিল বার্নস? এঙ্গেলসের ওই ছোট্টো লেখাটা?
একজন হয়তো একটু বেশী পড়েছে।
সে অন্যকে পড়ায়;
ঘুমোতে তাদের দেরী হয়ে যায় প্রতিদিনই।
একসাথে রাত কাটালে,

নির্ঘুম ভোর হয়ে যায়, ষ্টেশনের চায়ের দোকানে।

আর তারপর
একদিন কোথাও
নদীর তীরে, ষ্টিমারের অন্ধকার
তারায় ভরা ক্যাপস্টানের কাছ ঘেঁষে,
ইউনিয়ন কনফারেন্স শেষে নতুন শহরের রাস্তায়,
ডিসকানেক্টেড বগি ছেড়ে ঘুমন্ত গোমো প্ল্যাটফর্মে,
দিল্লীর শ্রমিক র‍্যালির ক্যাম্প ছেড়ে
রাস্তার ধারের কালভার্টে…
কোথাও এই পৃথিবীর
কোথাও অনেক রাত হয়ে যায়
কোনো একটি রাত অনেক রাত হয়ে যায়।
দুজনে একে অন্যের খুব কাছে চলে আসে।
একটা ছোট্টো প্রেম, একটা ছোট্টো বেদনা,
একটা ছোট্টো লোভ, স্বার্থপরতা, একটা ছোট্টো আত্মগ্লানি,
একটা ছোট্টো সন্দেহ, একটা ছোট্টো অন্ধবিশ্বাস,
নদী, মা গাছ, ঋতু, পাথর, স্বপ্ন, কুয়াশা ও ক্ষত,…

দুজনে একে অন্যের ভিতরে প্রবেশ করে।

আকাশ মহাকাশ হয়ে ওঠে।
তারারা নক্ষত্র ও গ্রহ, এষ্টেরয়েড ও অগ্নিপুঞ্জ হয়ে ওঠে।
অন্ধকার বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।
অস্তিত্বের নশ্বরতা শাশ্বত হয়ে ওঠে।
মৃত্যু খুব সহজ, যেন অতিক্রান্ত হয়ে ওঠে।

দুজনে একে অন্যের ভিতরে সদ্য পূর্ণ জন্ম নিয়ে
একে অন্যের দিকে তাকায়।
'কমরেড' তারা বলেনা,
তাদের দুজনের মাঝের বাতাস
অনুচ্চারিত ওই শব্দটায় আয়নাইজ্‌ড হয়ে ওঠে।...

৫

আবার একটা দিন হয়।
সারারাত
বর্ষার কোকিলের গলার ছোট্টো জায়গাটায় দুজনে
নিবিড় বাষ্প হয়ে ছিলাম ;
অন্য এক সূর্যের আলোয় হাত ছাড়াই
একে অন্যের হাত থেকে
মিশে যাই জীবনের ভীড়ে।...
বিকেলের সমাবেশে আবার দেখা হয়।
একে অন্যকে অভিবাদন জানাই
আর পাঁচজনের মতো।
তবু এক গভীর সমঝদারী
এক ভালোবাসা, এক বেপরোয়া আস্থা
সেই অভিবাদনের পিছনে আভাস হয়ে থাকে।
একটা নক্ষত্রের দুটো ঝিলিক হয়ে থাকে।
সেই নক্ষত্রের জন্য কাজ
দুজনের সামূহিক নির্জনতায়
জারি থাকে।

আজ এই রাতে, দিদির স্মৃতিতে

কে তুমি অন্ধকারে একা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ?

শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছো রাতের আকাশ,
ঘরে ঘুমন্ত শিশুর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছো শেষবার,
শেষবার দেখছো বাইরের নিঃশব্দ পৃথিবীর ওপর
মানুষের দুনিয়াটাকে
যা তোমায় বাঁচতে দিলোনা……!

হাত থেকে নামাও কেরোসিন অথবা বিষের বোতল।
কড়িকাঠ থেকে শাড়িটা খুলে পরে নাও।
যাও।
নদীতে ডুব দিওনা, পার করো।
পারো তো মাঝির কাছে জীবনের হদিশ জেনে নিও ;
বড়ো প্রাচীন আর উজ্জ্বল এই কথাটা
আমি আবার বলছি।

ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে দাঁড়িওনা, ষ্টেশনে যাও।
ট্রেণে ধানকাটনি পরিবারের মেয়েদের দেখা পাবে—
ওরা দেশান্তরী পাখীদের মতো—
পারলে ওই দেশান্তরী পাখীদের সাথে আলোচনা করো ;
বড়ো গতিশীল, ঝড়ের মতো এই কথাটা
আমি আবার বলছি।

যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।
পাথর ভাঙো, জেল খাটো, নষ্ট হয়ে যাও।
যা ইচ্ছা করো।
অনেক বড়ো এই পৃথিবী ;
যতদিন জীবন
কোনো কথাই শেষ কথা নয়,
কোনো পরিচয় শেষ পরিচয় নয়,
কোনো মৃত্যু অনতিক্রম্য নয়।

রাতের এই সময়
তোমার শেষ নয়
এক ভিন্ন তোমার শুরু।